ফেয়ারওয়েল টু লাভ

বয়স এখন সত্তরের ওপর। এক রকম জোর করে চলাফেরা করা। শারীরিক মানসিক অবস্থা ভালোই এক রকম। রুটিং মাফিক চলতে হচ্ছে। ডায়াবেটিস আছে তবে কন্ট্রোলে। রোজ না হলে দু একদিন পরপর গ্রামের বাড়ি ভ্যালেন্টাইন হাউস এ যাওয়া আসা করি। মিনি কৃষি ফার্মের কাজ দেখাশুনা করি। ছেলে বলে আব্বা কি লাভ পঞ্চাশ-ষাট টাকা খরচ করে। এ টাকা দিয়ে তো ঢাকায়ই সব পাওয়া যায়। আমি বলি, পাওয়া তো যায় কিন্তু নির্ভেজাল তো নয়। এ বছর তো বেগুন বিক্রি হলো পঞ্চাশ ষাট টাকা কেজি। অথচ আমরা সারা বছর নিজ ক্ষেতের উৎপন্ন শাক-সবজিই খাচ্ছি। টাটকা, ফ্রেস ও ভেজালমুক্ত। গোলআলুও এ বছর বেশ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে। অথচ আমরা বছরে এগারো মাসই নিজ ক্ষেতের গোলআলু খেয়েছি। পেপে তো সারা বছর ধরেই আছে। আমাদের গাছে পেপে ধরেছে কোনো কোনোটায় বছরে ১,০০০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত। নিজেরা খাই, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের দেয়া হয়।

গত বছর সবচেয়ে বড় খবর হয়েছে ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। নরওয়ে থেকে তার ঘোষণার আগেই আমি আর এক বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত সচিবকে বলেছিলাম আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ড. ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাই এ প্রাপ্তিতে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত। ভালোবাসার কথা লিখতে গিয়ে কতো সব কথা লিখে ফেলছি। আসলে সবই ভালোবাসার কথা। ড. ইউনূস দরিদ্র লোকের কথা ভেবে, দেশের কথা ভেবে ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তন করেন। এ ঋণ নিয়ে অনেক গরিব লোক অন্তত ভালোভাবে চলতে পারছে। সুদখোর মহাজন থেকে হতদরিদ্র লোকদের বাচিয়েছেন। ভালোভাবে বেচে থাকতে অর্থের প্রয়োজন আছে। ভালোবাসতেও টাকা-পয়সা লাগে। অভাবের সংসারে ভালোবাসা থাকতে চায় না।

আমাদের ভালোবাসার প্লাটিনাম জুবিলী চলছে। বয়স হয়েছে এখন আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। তবে কি না ভালোবাসার দেবী যিনি এখন আমার স্ত্রী। তার চাওয়া পূর্ণ হয়নি। সে চায় আমি যেন সেই ত্রিশ-চল্লিশে ফিরে যাই। জীবনের বেক গিয়ার চলে না। গত দিন ফিরে আসে না। শুধু স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। মিয়া-বিবির ঝগড়া তো কমবেশি থাকেই, আমাদেরও আছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ফিরে দেখছি ফেলা আসা দিনগুলোর স্মৃতি। এখন এই বুড়ো বয়সে সব চাইলে তো আর পাওয়া যায় না। সব কথা সবাইকে বলাও যায় না। এখন চলছি পেনশন ভাতা, মাস ভাতা, আত্মীয়স্বজন-এর স্পেশাল টিপস-এ। মাঝে মাঝে লেখালেখিতেও কিছু সম্মানি পাওয়া যায়। দেশ ও জাতিকে ভালোবেসে গেলাম কিন্তু দেশ আমাকে দিলো কিছু বঞ্চনা। অনেক ভালো কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলাম এখনো আছি।

পাঠক ফোরামের সদস্যরা নানা বলে ডাকে। বয়স বেশি বলে তরুণ-তরুণীরা ভালোবাসে। কারণ এ বয়সে তো আর মেয়েদের উত্ত্যক্ত করতে যাবো না। তাই বাসে-টেম্পোতে মেয়েরা বুড়ো চাচা, মামা, নানাকে সহযাত্রী হিসেবে বেশি পছন্দ করে। অনেক নাতিরা অনেক সময় ঈর্ষা করে থাকেন।

আত্মজীবনী লিখছি। জানি না তা সময়মতো প্রকাশ করতে পারবো কি না। অনেক পাঠক বন্ধুরা বলছে, নানা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলুন। সৃষ্টিকর্তা আমার প্রতি অনেক দয়ালু, যখন যা চেয়েছি তা দিয়েছেন। কাজেই আমি আশাবাদী সব ভালোভাবে চলে যাবে। সবাই ভালো থাকুক এ কামনাই করি। আগামী ২০০৮ সালে আমি চাই আমেরিকায় একজন নারী প্রেসিডেন্ট। হয়তো তা হবে - আমার দেখা নাও হতে পারে।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

অপারেশন

ওকে ভালোবেসেছি।

হয়তো ভুল করেছি!

দশ বছর বয়সী উজ্জ্বলের প্রতি সৃষ্টি হওয়া ভালোবাসা আমাকে দংশন করছে প্রতিনিয়ত। তাই মাঝেমধ্যে মনে হয় ওকে ভালোবাসাটাই হয়েছে ভুল নয়তো বা অকালপক্কতা।

তাহলে খোলাসা করেই বলি। ঠোঁট ও মুখের তালু কাটা নিয়ে আমার জন্ম হয়েছিল প্রতিবন্ধী হিসেবে। বেশ কিছুটা ভাগ্যের জোরে অপারেশন করে ঠোঁট জোড়া দিলেও দিতে পারিনি বা দেয়া হয়নি মুখের তালুটা জোড়া দেয়া। তাই কথা স্পষ্ট হয় না।

এই সমস্যার কারণেই কখনো কখনো বেশ বিড়ম্বনায় পড়ি। আবার কখনো ...

সে যাই হোক উজ্জ্বলের সমস্যাটাও আমারই মতো। ওর সঙ্গে পার্থক্য আমার বয়সে আর কিছু অর্থনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে। তাছাড়া আমরা একই গ্রামের বাসিন্দা। প্রায়ই একই সঙ্গে সময় কাটানো হয়। প্রচণ্ড মেধাবী ছেলেটা। পড়ে ক্লাস টুতে গ্রামেরই স্কুলে।

উজ্জ্বলকে এখনো অপারেশন করালে কথা স্পষ্ট হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বর্তমানের বয়সটা পার হয়ে অপারেশন করিয়েও লাভ হবে না। স্পষ্ট হবে না কথা। তাইতো প্রচণ্ড ইচ্ছা করে ওর অপারেশন করার ব্যবস্থা করি। কিন্তু পারি না। পারি না আমার সামান্য অর্থনৈতিক দিকটা ততোটা সাপোর্ট করেনি বলেই। লটারির টিকেট কিনেছি বেশ কয়বার। না, ওখান থেকেও সাড়া পাইনি। অথচ অবিরাম বয়ে চলা নির্মম সময় আমাকে ফাকি দিয়েই ওর বয়সটা বেশি করে দিচ্ছে! এ কারণেই একটা সময় কিছু করতে চাইলেও লাভের

অঙ্কটা শূন্যতেই থেকে যাবে।

হয়তো আমি পরাজিত হতে চলেছি আমার একমাত্র প্রেম ভালোবাসা যাই বলি না কেন তারই কাছে! আপনারা কেউ কিছু করবেন আমার ভালোবাসাকে জয় করাতে?

সবশেষে, নিজের স্বীকারোক্তি দিয়েই শেষ করছি আর সজ্ঞানে বলছি, আমি কখনোই উচ্ছলের প্রতি ভালোবাসাতে আবদ্ধ হতাম না, যদি আমি পরিপূর্ণ স্বাভাবিক হতাম। এটাই সত্য, এটাই স্বাভাবিক।

চালা, উল্লাপাড়া থেকে

নাসিহা

আবিদ করিম মুন্না

স্কুল লাইফে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত প্রেমের নাটকগুলো দেখতে ভালো লাগতো। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের অভিনয়ে ভীষণ মুগ্ধ হতাম। মনে হতো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে আমিও ওদের মতো একদিন প্রেমের মহাসাগরে হারিয়ে যেতে পারবো।

সত্যিই এক সময় সুযোগ পেয়ে গেলাম দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে। ভালোবাসা দেয়া কিংবা পাওয়ার আশায় দিন যেতে থাকে। ব্রহ্মপুত্র নদের স্বচ্ছ জল গড়িয়ে দিনের পর দিন আসে। বুকের মাঝে বাংলা গানের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী মান্না দে-র গাওয়া জনপ্রিয় যদি কাগজে লেখো নাম গানটির হৃদয় আছে যার সেইতো ভালোবাসে প্রতিটি মানুষেরই জীবনে প্রেম আসে - শুধু এই অংশটুকু বার বার অনুরণিত হতে থাকে।

আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পা রাখি তখনও মেয়েদের এখনকার মতো অতোটা সমাগম ছিল না। এমনিতেই ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের আকাল, তাও বা যা ছিল তার মধ্যে সিংহভাগই ছিল রক্ষণশীল। আমাদের মধ্যকার কিছু সংখ্যক প্রেমানুরাগী বন্ধু একটি জরিপ চালিয়ে দেখেছে

১০০ : ১ অর্থাত্ প্রেমিকের সংখ্যা যদি ১০০ হয় তবে প্রেমিকা ছিল মাত্র ১ জন। স্বপ্নের সেই সুচিত্রা সেনকে পাওয়ার জন্য শুধু কি বাবার টাকা দিয়ে একদিন চাইনিজ কিংবা বাংলা মুভি দেখাতে নিয়ে গিয়ে তিন ঘণ্টা সিনেমা হলে অন্তরঙ্গভাবে সময় কাটানোই যথেষ্ট ছিল না। এর সঙ্গেও ছিল হরেক রকমের ত্যাগ। যেমন ধরুন, এক সঙ্গে লাইব্রেরি ওয়ার্ক, প্র্যাকটিকাল খাতার জটিল ড্রইংগুলো করে দেয়া, ঐতিহাসিক আবদুল জব্বারের মোড় থেকে নিজ খরচে নোট ফটোকপি করে যথাসময়ে লেডিস হলে সাপ্লাই দেয়া কিংবা প্র্যাকটিকাল ক্লাসের অংশ হিসেবে ধান কিংবা গম ক্ষেতের প্লট নিড়িয়ে দেয়া। তারপরেও কি সুচিত্রা সেনদের মন গলে! একজন উত্তম কুমারের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা একান্ত আবশ্যক তার কোনোটিই আমার মধ্যে কোনোকালেই ছিল না। বিশেষ করে টেকনিকাল এডুকেশনের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিকাল ক্লাসেই নানা প্র্যাকটিকাল ওয়ার্কের মাধ্যমে প্রেমের প্রথম পরশটি পাওয়ার সুযোগটি আসে। সেটি থেকেও আমি বঞ্চিত ছিলাম।

ইউনিভার্সিটির প্রায় পুরো জীবনটাই নয় নাম্বার প্র্যাকটিকাল গ্রুপে কাটিয়েছিলাম। কৃষি অনুষদের তিনটি সেকশনের প্রতিটিতে তিনটি আলাদা গ্রুপ ছিল। আমাদের গ্রুপটিতে ফার্স্ট ইয়ারে কোনো ছাত্রীই ছিল না।

আমার সেই দীর্ঘদিনের লালিত প্রেম এখানে এসেও হোচট খেলো। বলা চলে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে এসে গোড়াতেই কো-এডুকেশন থেকে পুরোপুরি বঞ্চিতই ছিলাম। পাশাপাশি শিক্ষকরাও ক্লাস নিয়ে বেশি একটি মজা পেতেন না ছাত্রীশূন্য ছিল বিধায়।

তবে সেকেন্ড ইয়ারে এসে নয় নাম্বার গ্রুপের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যান্য গ্রুপের বিচ্ছিন্ন প্রেমিক-প্রেমিকারা জরিমানা দিয়ে ইচ্ছে করে দেরিতে ফরম ফিলাপ করে ইউনিভার্সিটি জীবনের বাকি দিনগুলো এক সঙ্গে থাকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা অনুসরণ করতো। এক্ষেত্রেও আমি ছিলাম ব্যর্থ। আমাদের গ্রুপে মেয়েদের ব্যাপক সমাগম ঘটলেও তারা বুকড হয়েই আসতো। এভাবেই একসময় এসে পৌছলাম ইউনিভার্সিটি জীবনের শেষপ্রান্তে।

মনে বড় হিংসা জাগতো যারা পত্রমিতালী করতো তাদের দেখে। আমিও তীর্থের কাকের মতো প্রহর গুনতে থাকি এতো বড় এই পৃথিবীতে আমার সঙ্গে পত্রমিতালী করার কি কেউ নেই?

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় টুকটাক লেখালেখি শুরু করলাম। জাতীয় সংবাদপত্রের একটি ম্যাগাজিনে 'বাবার দেশ পত্রিকা প্রেম' শিরোনামে লেখাটি প্রকাশিত হলে কয়েক দিনের ব্যবধানে একে একে ১৯টি চিঠি পেয়ে যাই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের কলেজ-ইউনিভার্সিটি পড়–য়া মেয়েদের কাছ থেকে। প্রায় প্রতিটি চিঠিতে আমি প্রেমের ছোয়া অনুভব করেছি কিন্তু তখন আমার অবস্থা ছিল সেই বিখ্যাত ট্রান্সলেশনটির মতো - দি পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দি ডক্টর কেম। কারণ তখন সবকিছু মাথা থেকে ঝেরে ফেলে দিয়ে একটাই নেশা কাজ করছিল -

চাকরি না পেলেও কোনো একটা কাজের সঙ্গে লেগে থেকে কিছু উপার্জন করতেই হবে।
বাকৃবি ক্যাম্পাস ত্যাগ করে রংপুর ফিরে গিয়ে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতার পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় শুরু করলাম গাছপালা বিশেষ করে ওষুধি উদ্ভিদ নিয়ে লেখালেখি। আমার বাবা কিছুটা চাইলেও মা চাইতেন না লেখালেখি করে ব্রেইন ক্ষয় করে মাথার সব চুল পাকিয়ে ফেলি। তারা চাইতেন অন্য পেশাতে যেন চেষ্টা করি। তাদের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুপি চুপি লেখালেখিটা চালিয়ে যাই।
এরই মাঝে একদিন চিঠি পাই একটি মেয়ের। চিঠিটি পড়ে জানতে পারি সে আমার লেখালেখি বিশেষ করে গাছপালা বিষয়ক লেখাগুলোর দারুণ ভক্ত। কিন্তু সেই ১৯টি মেয়ের চিঠির মতো তার চিঠির কোথাও ভালোবাসার কোনো গন্ধ আমি খুজে পাইনি। তার লেখা চমৎকার চিঠির শেষ দুটো লাইন - ভাইয়া, চিঠির উত্তর পাবো কিনা জানি না। তারপরও আশায় রইলাম। অংশটুকুই আমার হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কাটে। আমি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তখনই তাকে চিঠি লিখতে বসি। এরপর আমাদের মাঝে ভাইবোনের মধুর সম্পর্ক বিরাজের পাশাপাশি অনেক চিঠিই বিনিময় হয়েছে এবং সুযোগও মিলেছিল দু একবার সরাসরি দেখার।
ডাবল এ প্লাস না পেয়েও ওয়েটিং লিস্টে থেকে সে উত্তরবঙ্গের একটি সরকারি মেডিকাল কলেজে চান্স পায়। আমি দীর্ঘদিন ধরে লালন করছিলাম মেডিকাল স্টুডেন্টদের লাইফ নিয়ে কিছু একটা লিখবো। মেডিকাল লাইফের প্রথম দিনের নানা অভিজ্ঞতা বিশেষ করে অ্যানাটমি প্র্যাকটিকাল ক্লাসে লাশের সঙ্গে পরিচিতির ভয়ঙ্কর মুহূর্ত ছাড়াও হস্টেল লাইফের সুখ-দুঃখের অনেক কথাই সুন্দরভাবে লিখে জানিয়েছিল। কিন্তু সে জানারও অপমৃত্যু ঘটে আমাকে লেখা মেডিকাল লাইফে তার দ্বিতীয় এবং শেষ চিঠিটি পেয়ে।
ভাইয়া
আমি খুব সরি। আমি আপনার সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করতে বাধ্য। এর কারণ আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না। তবে সিওর থাকেন এতে আপনার কোনো দোষ নেই। প্লিজ আপনি আর আমাকে ফোন দেবেন না। আপনার সঙ্গে দেখা হলে ভান করবো চিনতে পারিনি। সৌভাগ্যক্রমে ভাইয়া হিসেবে আপনাকে পেয়েছিলাম আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। আজ সেই আমি আপনার সঙ্গে অকৃতজ্ঞের মতো আচরণ করছি। প্লিজ ভাইয়া, আপনি আমাকে কোনোদিন ক্ষমা করবেন না।
ইতি
নাসিহা
নাসিহার লেখা চিঠিগুলো আমি এখনো সযত্নে লালন করছি।
মিরপুর, ঢাকা থেকে
abidkarimbau@yahoo.com

আমার হাজব্যান্ড

নুসরাত জাহান
কিছুদিন আগে আমার মোবাইলে সন্ধ্যায় আমার হাজব্যান্ডের রিং এলো। রিসিভ করতেই ওপাশে ওর কান্নার আওয়াজ শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম।
কাদছো কেন, জিজ্ঞাসা করতেই কান্নাজড়ানো কণ্ঠে কোনোমতে উচ্চারণ করলো, আমার কুইনি কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। এটা বলেই আবারও কান্না শুরু।
আমি ওকে কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। খুব কষ্টে হাসি চেপে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম থাক, সবাই তো আর চিরদিন বেচে থাকে না। তা কিভাবে মারা গেল?
কান্নার শব্দ আরো বাড়লো। কিছুক্ষণ পর বললো, বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে।
এই হলো আমার হাজব্যান্ড। কিছুক্ষণ আগে ওর আদরের বিড়াল মারা যাওয়ায় ওর এই অবস্থা।
ছয় বছর ভালোবাসার পর আমাদের বিয়ে হয়েছে। পশুপাখির প্রতি ওর যে ভালোবাসা তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ওর মুখ থেকেই শোনা, ওর ছোটবেলার একটা স্মৃতি। ওরা যাচ্ছে যশোর এয়ারপোর্টে, পথিমধ্যে একটা কুকুরকে দেখলো রাস্তায় মরে পড়ে আছে এবং কোনো কোনো গাড়ি সেটার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। ওর কান্নাকাটিতে গাড়ি আবার পিছিয়ে এনে সেই কুকুরকে রাস্তার পাশে গাছের নিচে রেখে আবার রওনা হয় ওরা।

শীতের বিকাল, আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছি, হঠাত্ ওর চোখ পড়লো কয়েকটা কাকের ওপর। কাকগুলোকে তাড়িয়ে দেখে হলুদ রঙের একটা পাখি পড়ে আছে, শরীরে বেশ কয়েকটা ক্ষত। ও দ্রুত পাখিটা নিয়ে চা-স্টল থেকে গরম পানি এনে ক্ষত পরিষ্কার করে নেবানল পাউডার দিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ডাক্তার পায়নি। পাখিটাকেও বাচাতে

পারেনি। ফলস্বরূপ আবারও ওর চোখের পানি।

ওদের বাসায় অনেক বিড়াল, কোনো বিড়াল যদি চুরি করে খাবার খায় আর কেউ যদি বিড়ালকে কিছু বলে তাহলে তার খবর আছে। ওর ভাষ্য অনুযায়ী ক্ষিধে পেলে মানুষ চুরি করে খায় আর ওরা তো কথা বলতে পারে না, ওরা যদি কথা বলতে পারতো তাহলে তো ওরা চেয়েই খেতো।

রাস্তায় ওর সঙ্গে তো চলাই কঠিন। দুজনে বেড়াতে বেড়িয়েছি, কোনো কুকুর যাচ্ছে তখন ও ডেকে একটা টোস্ট বা বিস্কুট খাওয়াবে। ওর কথা হলো, মানুষের প্রতি ভালোবাসা আছে কিন্তু প্রাণীদের কথা তো কেউ ভাবে না, ওদেরকে রক্ষা করা উচিত। শীতের সময় অতিথি পাখি মারা হয় আমাদের দেশে। এ নিয়ে ওর চিন্তা শেষ নেই। ওর চিন্তা ও দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার চেষ্টা করবে এবং প্রথমে ছোট ছোট কাজ করেই শুরু করবে সব কিছু।

মাঝে মধ্যে ওর এসব কাজ দেখলে রাগ হয়, আবার মনে মনে ভাবি কতো বেশি ভালোবাসে ও আল্লাহর সব সৃষ্টিকে।
সত্যিই ভালোবাসি আমার এই পশুপ্রেমী হাজব্যান্ডকে।

গোলাপবাগ, ঢাকা থেকে

দুঃসময়ে

পার্বতীপুর স্টেশনে দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় হঠাত্ই তার ওপর নজর পড়ে গেল। একটু বিস্মৃতি নিয়ে তাকালাম তার দিকে। অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। আমি তার দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে আছি, নির্লজ্জ বেহায়ার মতো। হয়তো সবাই এমনই মনে করছে। কিন্তু আমি তাদের কেমন করে বোঝাবো - আমি কোনো রমণী দেখছি না, দেখছি আমার সেই চির চেনা প্রিয় মানুষটির মুখ। পরিবর্তন যাকে কষ্ট ছোয়ার মতোই খুব কঠিনভাবে ছুয়েছে।
সে দিনের দুঃসময়টা ছিল ঠিক আজকের এ দুঃসময়ের মতোই। প্রায় অপ্রস্তুতভাবেই ঘটেছিল ঘটনাটা। তারপর সময়টা খুব দ্রুতই পার হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক কচু পাতার ওপর পানি পড়ার মতো। কিন্তু কচু পাতা থেকে যে পানি সেই কবে পড়ে গেছে তা খেয়াল করার অবসরই হয়নি।
দুঃসময়ের দিনটা ছিল এমনই এক ১৪ ফেব্রুয়ারি।

রংপুরের উদ্দেশে ১০টার ট্রেনে উঠলাম এ পার্বতীপুর স্টেশন থেকে। ট্রেনের এ-কামরা ও-কামরা ঘুরে এমন এক কামরায় এসে উপস্থিত হলাম, যে কামরায় একা বসে আছে এক সুন্দরী তরুণী। হাতে লাল টকটকে একটি ফুটন্ত গোলাপ। তার সামনে দাড়াতেই সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। এতোটুকু বিরক্তির ছাপ নেই, বরং বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে যেন। চোখ দুটি হয়ে উঠেছে চঞ্চল। মায়ায় জড়ানো লাজুক দৃষ্টি। যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু ওপাশ থেকে কেউ কন্ঠনালি চেপে ধরে। মন জুড়ে অস্থিরতা, উত্তেজনায় ঠোট দুটি কাপছে থরথর। নব পল্লব যেন আজ জেগেছে নব আনন্দে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বসতে পারি কি?

জবাব এল, নিশ্চয়ই।

তার মিষ্টি কন্ঠস্বর আমাকে তার সান্নিধ্যে আরো আগ্রহী করে তুললো। আমি তখনি বসে পড়ে বললাম, আজকের এ বিশেষ দিনে কোথা থেকে এসেছেন?

সে আগ্রহ নিয়ে বললো, গাইবান্ধা।

আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। এতোদূর থেকে একটি মেয়ে একা এসেছে পার্বতীপুরে! জানতে চাইলাম, পার্বতীপুরে এসেছিলেন কেন?

বললো, এক বান্ধবীর কাছে এসেছিলাম গত পরশু, আজ চলে যাচ্ছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি একাই এসেছিলেন?

বললো, হ্যা।

জিজ্ঞাসা করলাম, এতোদূর থেকে একাই এসেছেন, ভয় করেনি? নাকি আপনি এমনই একা?

জানালো, আপনি করে বলছেন কেন? তুমি করে বল।

বললাম, নিজে থেকেই অধিকার দিয়ে দিলেন?

বললো, এমন একজনকে অধিকার দেবো বলেই তো আমি একা।

আমি একটু বিপাকে পড়ে গেলাম। বললাম, বড় জটিল উত্তর দিলেন বলে মনে হচ্ছে।

বললো, এ মুহূর্তে সব কিছু জটিলই মনে হওয়ার কথা। আপনিও তো একাই গন্তব্যে যাচ্ছেন। আর আমি এমনই একজনের অপেক্ষায় ছিলাম। যার যাত্রা আমার মতোই একা হবে।

বললাম, হঠাত্ মনের বাসনা এমন হওয়ার কারণ কি?

বললো, কারণ আমি যে একা!

তার কথা শুনতে শুনতে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। তাকিয়েই আছি। এমন সময় সে আমাকে বললো, প্লিজ, ফুলটা নিন।
আমি তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে লাল টকটকে গোলাপটি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ধরে আছে। মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম, দেখলাম, সে আমার দিকে মাথা নেড়ে হ্যা-সূচক উক্তি করলো। অনিচ্ছা সত্বেও ফুলটা গ্রহণ করতে হলো। কারণ এমন একটি ফুল দেয়ার মতো আমার কেউ ছিল না। যদিও ছিল না তারপরও একটি গোলাপ প্যান্টের পেছন পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। আর সেটাই তাকে দিলাম।
সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল নদীর স্রোতের মতোই। সম্পর্কও গড়িয়ে যেতে শুরু করলো।
সেদিন তার জন্মদিন। যেতেই হবে। সে বলেছিল, কেক কাটা হবে রাতে। আমি সন্ধ্যায় তার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হবো। তারপর অনুষ্ঠান শেষে সেই রাতটা তার বাসায় কাটাবো এবং পরের দিন একত্রে আবার পার্বতীপুর তার বান্ধবীর বাড়িতে আসবো।
আমি বিকালের দিকে পার্বতীপুর স্টেশনে এসে শুনতে পেলাম দেশ জুড়ে অবরোধ। সব যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। আমি অবাক হয়ে গেলাম। অস্থিরতা আমার মন জুড়ে দানা বেধে রইলো। আমি কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। বড় অসহায় হয়ে গেলাম। এতো দূরের পথ আমি পাড়ি দেবো কি করে। রিকশা বা ভ্যানে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই। অবশেষে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।
রাতে আর ঘুম আসতে চায় না। ভাবনাও পিছু ছাড়ে না। করার মতো কোনো কাজও খুজে পাই না।
তারপর থেকে সে আমার সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। ক্রমেই আমার অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। কোনোভাবেই তাকে বোঝাতে পারলাম না - আমি নির্দোষ।
সুখময় সেই প্রেমের দিনগুলো কেমন করে যে উড়ে গিয়েছিল তা বুঝতেই পারিনি। আর এখন সময় কাটতে চায় না। মনে হয়, সময়গুলো মরুভূমির বালুচরের চোরাবালিতে পা দিয়ে বারবার ফিরে আসছে কষ্টের সেই প্রথম সিড়িতে। কষ্টের নোনাজল গড়িয়েই চলেছে। যেন তাদের ছুটে চলার এটাই উত্তম মৌসুম। সেই ১৪ ফেব্রুয়ারি আমার জীবনে দুঃসময়ের অভিশাপ।
আজ আবার সেই দুঃসময়ের অভিশপ্ত দিনটিতে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাত্ হলো এ চিরচেনা পার্বতীপুর স্টেশনে। আর মাঝখানে চোরাবালির ফাদে পড়ে নানা কষ্টে জর্জরিত হয়ে কেটে গেছে জীবনের তিনটি বছর।
আজ এতোদিন পর তাকে চোখের সামনে দেখেও মনে হয় না, আমি তার সামনে দাড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছি। তার চোখের নিচে একটু কালি জমেছে। মনে হয়, রাত জাগে।
সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার সেই উৎসুক চোখের চাহনিতে আশার প্রদীপ জ্বলছে। বহু আশার প্রদীপ জ্বেলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার সেই চোখে কোনো রাগ কিংবা অভিমান নেই। বরং বহু আশার সমন্বয় ঘটেছে। তার শুকনো শরীরের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, বহু কষ্টের সাগরে সেদ্ধ হয়ে শুদ্ধ হয়েছে এ তিনটি বছর।
এমন সময় সে আমার কাছে এসে মাথা নিচু করে বললো, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। সেদিন তোমার কোনো দোষ ছিল না। সব কিছু আমার ভাবনার ভুল। আর এ ভুলের জন্য জীবন থেকে হারিয়ে গেল সুখময় তিনটি বছর। জানি, এ সময় আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এখন তা শুধুই অতীত নামক কষ্টমাখা স্মৃতি। আজ আমি তেমনি এক ১৪ ফেব্রুয়ারিতে আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছি। প্লিজ, আমাকে ফিরিয়ে দিও না।
আমি তার দিকে কেমন বিস্মৃতির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েও মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে পড়লাম।
পার্বতীপুর, দিনাজপুর থেকে

স্বপ্ন ভূক

সুফিয়া জামান

যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে, ভালোবাসার এ আকালের দিনে, ভালোবাসার হিসাব-নিকাশ করা যায় - এ ভালোবাসা দিবসে। কিছুটা সময় হয়তো বিচরণ করা যায় স্বপ্নালোকে বা স্মৃতি রোমন্থনে। প্রিয় মানুষটির কাছে পৌছে দেয়া যায় হৃদয়ের আকুতি, ভালোবাসার আহ্বান। বসন্তের আগমনে গাছে গাছে যেমন নতুন পাতা গজায় তেমনি মানবমন হিল্লোলিত হয় নানা রঙে। মধুর বসন্তে প্রেম আর মিলন প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয় মানবকুল।
প্রেমের অসাধারণ, অবর্ণনীয়, অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে ভর করে গড়ে ওঠে নতুন নতুন স্বপ্নের পৃথিবী। কোথা থেকে যেন কি হয়ে যায়। ওলোট-পালোট করে দেয় সবকিছু। জগতজোড়া ভাবনা-চিন্তা এসে জড়ো হয় কোনো এক প্রিয় মুখে।
আমার যে প্রিয় মুখ, সে মুখ আমার অস্তিত্বের অহঙ্কার। অনেক চাপ চাপ কষ্টের মাঝে সে মুখ আমার এক ফোটা সুখ। আমার মনের গহীন বনে থাকে তার স্বপ্ন, তাকে ভালোলাগা আমাকে বিভোর করে রাখে। সে স্বপ্নকে আমি লালন করি প্রতিনিয়ত। সে স্বপ্নের মাঝে যখন তলিয়ে যাই তখন নিজেকে খুজে পেতে বড় কষ্ট হয় আমার। কারণ সে যে আমার হৃদয়জুড়ে বসে আছে। ফোনের ও প্রান্ত থেকে যখন সে

বলে, তোমার জন্য আমার দরজা সব সময় খোলা। তুমি এসো আমার ঘরে। অতি যতনে আমি তোমায় বরণ করে নেবো। তখন আমার কি যে হয় সে কণ্ঠ আমায় শিহরিত করে। আবেগে আপ্লুত হয়ে কণ্ঠরোধ হয়ে যায় আমার। কথা বলতে পারি না আমি। ইচ্ছা করে নির্জনে তার মুখোমুখি বসে হাতে হাত রেখে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি তার দিকে। কিন্তু বাস্তব, সে যে বড় কঠিন।

এমন যদি হতো স্বপ্ন আর বাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতো। বাস্তবে পরিবারের চাহিদা মেটাতে আমি ক্লান্ত। সেখানে আমার কথা ভাববার কেউ নেই। সংসারের চাপে যখন ক্লান্তিতে, অবসাদে, বিষণ্নতায় ভরে ওঠে মন, যখন কেউ বুঝতে চায় না। আমার অপারগতা। তখন আমার ইচ্ছা করে আমার প্রিয় সেই মানুষটির একটু সহানুভূতি পেতে, একটু স্পর্শ পেতে। একটু কথা শুনতে। আর তখনই তাকে ফোন করি। একটু কথা হয়। তার ভরাট কণ্ঠে মমতাভরা সুন্দর কিছু কথা যুগ যুগ ধরে এই অন্তরে লালন করছি এবং করবো। এভাবেই আমার সুখের সঙ্গটা তৈরি করেছি। হোক না তা স্বপ্নলোকে। তবু তাতে কারো ক্ষতি তো আর হচ্ছে না। দুদিনের এ খেলাঘরে সে ডাকলেও তার খোলা দরজা দিয়ে তার ঘরে যাবো না। কারণ আমি অনন্ত জীবনে তার স্বপ্নিল চোখে চোখ রেখে হারিয়ে যেতে চাই বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে।

আমি একজন ভালো মা, ভালো সহকর্মী, ভালো প্রতিবেশী। তাই সন্তান, সহকর্মী, প্রতিবেশীরা আমাকে যেভাবে দেখতে চায়, আমি সেভাবেই জীবনের পথ চলবো। তা সে পথ যতোই কন্টকময় হোক।

গুলশান, ঢাকা থেকে

নিখাদ

তিনি আমার চেয়ে বিশ বছরের বড়। ট্রান্সফার নিয়ে এসেছেন আমাদের ফ্যাসিলিটতে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি তার দিকে। তার চোখ, তার মুখ, তার উষ্ণতা, তার সম্পূর্ণতা আমাকে ঈর্ষান্বিত করে সেই পুরুষের প্রতি, যে তাকে পেয়েছে।

আমি ভাবতে থাকি কোনো নারী এতো পরিপূর্ণ হয় কি করে? আর ভাবি, তার বিশ বছর বয়সী যৌবনে তিনি কেমন ছিলেন, কতো আগুন না জানি তিনি ধরিয়েছিলেন ফাগুনের ডালে ডালে।

তার রঙ ছিল লেবানিজ নারীদের মতো। আর সবচেয়ে ভালো দিক তিনি শান্ত, চুপচাপ, গম্ভীর আর দরকারি কথা ছাড়া অন্য আলাপ নেই তার মুখে।

আমার মনে হয়েছিল - কেন যে কমপক্ষে আরো বিশ বছর আগে জন্মালাম না। এই নারীর জন্য আমি সপ্তম এডওয়ার্ডের রেকর্ড ভাঙতে পারতাম।

অবশ্য আমার ইন্টার লাইফে সে সুযোগ এসেছিল। কিন্তু পারিনি এডওয়ার্ড হতে। উল্টো এডমায়ারার বনে গিয়েছিলাম।

বড় আপার এক বান্ধবীকে এতো ভালো লেগেছিল যে, মনে হয়েছিল তাকে না পেলে আমি বাচবো না। সেই আপু আমাকে ধোকা দিয়ে তখনি লাভ ম্যারেজ করে ফেলেছিলেন বাড়ির কাউকে না জানিয়েই। জেনে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। বুকের মাঝে ব্যথার মতো কিছু একটা অনুভব করেছিলাম।

আমার আজকের লেখার নারীর নাম সূচনা। কাজে, কথায়, হাসিতে তিনি অসাধারণ। আমাদের এখানে আসার কিছুদিন পর তাকে আমার অধীনে ট্রান্সফার করে দেয়া হয়। আস্তে আস্তে আমি সূচনাকে জানতে শুরু করি। শুরু হয় সূচনা আর আমার মধ্যে গভীর এক সম্পর্কের সূচনা। আমি চাই তিনি প্রতিদিন অফিসে আসেন। আর তিনি চান আমার গ্রুপ যেন সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স দেখাক। আমাদের মাল্টিন্যাশনাল কম্পানির এই ফ্যাসিলিটতে হাজার দুয়েক এমপ্লয়ি কাজ করে আর ৫০-৬০টা গ্রুপ আছে। আমার ভালো চাওয়াটা সূচনার প্রতি আমার মনে বসন্তের আগমনী বার্তা বয়ে আনে। মাঝে মাঝে সূচনা গোল সেটআপ করেন। আমি পুরা গ্রুপকে নির্দেশনা দেই কি করে সেটা পূরণ হবে। অথচ গোল সেটআপ করার কথা আমার। সূচনা মরিয়া হয়ে কাজ করেন যাতে আমরা টার্গেট-এ পৌছতে পারি। আমি আরো দ্রবীভূত হই।

এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সূচনা আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। নিজের আত্মীয় বলতে খালাতো-ফুফাতো কাজিন। তাও ভিন্ন স্টেট-এ। আমার একাকী ব্যস্ত দিন আর রাত কাটে দেশের কথা ভেবে। দেশে পার করা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকালের কথা ভেবে। আমার একুশ, বাইশ আর তেইশের ক্যাম্পাসের কথা ভেবে।

হায় কতো স্মৃতি, ছুটিতে বাড়ি ফেরা, মায়ের কোলে মাথা রেখে গল্প করা, আর সারা মাস অপেক্ষায় থাকা মায়ের হাতের নানা ধরনের খাবার। মা সেসব আইটেম বানাতেন আমি বাড়ি আসার আগের দিন।

শীতের পিঠার সঙ্গে সকালের চা ছিল প্রিয় সকালের খাবার। আর নানান রকমের ভর্তা খেতে ভালোবাসতাম দুপুরে ও রাতে। বিকালে ক্রিকেট কখনো কখনো সারাদিন (সপ্তাহ) আর রাতে বন্ধুদের সঙ্গে হালকা আড্ডা মেরে ঘরে ফেরা। ছুটিতে দেশের বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ানো।

হায়, এসব মধুর দিন ফেলে আমি কোথায়। আমি তাই দীর্ঘশ্বাস লুকাই ব্যস্ততার মোড়কে। সূচনার দাওয়াত তাই কবুল করি নির্দ্বিধায়। আমি ড্রাইভ করি আর ভাবি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত্।

কালো রঙের মার্সিডিজ সি-৩৫০ সিরিজের সর্বশেষ সংস্করণের নেভিগেশনে এন্টার করেছিলাম সূচনার ঠিকানা। মনিটরের নির্দেশনামতো ড্রাইভ করে এগুতে থাকি রাতের আধারে। নেভিগেশন সিগনাল দিল আমি এসে গেছি।

ডাইনিং টেবিলে হাজার রকমের খাবারের ভিড়ে সিম ভর্তা দেখে অবাক হই। কোনো একদিন গল্পে গল্পে সূচনাকে কথাটা বলেছিলাম আমি। আমি সূচনার দিকে তাকাই - তার গভীর দৃষ্টিতে আমি দেখতে পাই হাজার মায়ার প্রলেপ। তুমি তো নিজে নিজে আর এগুলো বানাতে পারো না, হয়তো ভালো লাগবে তোমার। সূচনাকে বলি আমার মা এটা বানাতেন।

সূচনার দৃষ্টির সরলতা আমাকে আরেকবার আকুল করে। বলেন, আমি কি তা নই। সত্যিই তো সূচনার ছেলে তো আমার বয়সই। অথচ তাকে দেখলে কে বিশ্বাস করবে।

বহুদিন আমেরিকাতে বসবাসকারী সূচনার স্বামী দারুণ মিশুক। আমি ধীরে ধীরে সূচনার পরিবারের সদস্য বনে যাই। তবে খুব কম যাই, কিন্তু ফিল করি বেশি - সূচনাও। তিনি অবশ্য সবসময় যাওয়ার জন্য বলেন, ভালো কিছু রাধলেও বলেন।

আমরা মানসিকভাবে খুব কাছাকাছি এসে গেছি - আমি বুঝে ফেলি। আমার মায়ের কথা মনে হয় বারবার - যতোবার তাকে দেখি ততোবার। আমি বুঝতে পারি আমার ভেতরের দৃষ্টি বদলে গেছে।

একদিন আমি কাদলাম। সূচনার কারণে। তিনি কষ্ট দিয়েছেন আমায়। সূচনার ওপর অভিমান করে আমি পুরা ইউনিট বন্ধ করে দেই। ঘরে গিয়ে বলি আপনি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন।

সূচনা বলেন, তুমি কি দাওনি? তুমি তো কাদিয়েছো। আমি বলি আমি নয় কাদিয়েছেন আপনি।

এভাবে দিন দায়, মাস যায়। মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই আমি একা আছি। আমার মরুময় ফ্যামিলিহীন জীবনে সূচনা বয়ে নিয়ে আসেন শ্রাবণের ধারা। আর আশ্বিনের নীল আকাশ।

সূচনা আমাকে দেন স্নেহ আর মায়ের মমতা। আমি এই ভালোবাসাকে বুকের গহীনে লুকিয়ে রাখি। আমার আলোর মিছিলে সূচনা দেন পূর্ণিমার আলো, আমার শরতে সূচনা আমাকে দেন কাশফুলের কাপন।

আমি মাঝে মাঝে অবাক হই। আমি খুজে পাই পৃথিবীতে এখনো অনেক কিছু বাকি আছে। এই সূচনাকে আমি তো শুধু এক নারী ভেবেছিলাম - অথচ আজ সূচনা আমার শ্রদ্ধা, আমার ভালোবাসা আর মন খুলে দুটি কথা বলার স্থান। আমি এই নিখাদ ভালোবাসার কি নাম দেবো? আমি জানি না, আমার জানা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
আমেরিকা থেকে
porobashi_ab@yahoo.com

প্রিয় মা-বাবা

মা... তুমি আমাদের এতো বেশি ভালোবাসো কেন? পৃথিবীর সব মায়েরাই কি এ রকম? বাবা, তুমি এতো সুন্দর কেন? বাবা, তোমার স্নেহের পরশে আমরা গর্বিত।

তোমরা দুজনে পৃথকভাবে আমাদের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা এবং মা কিন্তু তোমাদের দুজনের মাঝে যে তিক্ত সম্পর্ক তা আমাদের ভীষণ কষ্ট দেয়। বাবা-মায়ের মাঝে সর্বদা খারাপ সম্পর্ক সন্তানদের ওপর যে কতোটা কু-প্রভাব ফেলে তা তোমরা বোঝো না কেন?

রনী ও প্রবাল, রাজশাহী

সোনিয়া

পৃথিবীতে যদি ভালোবাসার কোনো অস্তিত্ব থাকে তাহলে আমার অস্তিত্ব তুমি। ভালবেসেছিলাম এবং তা অটল থাকবে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত শুধু তোমারই জন্য। যদিও জানি না এতে তোমার ভয়ের সঠিক কারণটি। তবে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ঊর্ধ্বে রেখে তোমাকে জয় করবো আমি। তাদের মতামতের পাশাপাশি তোমার অভিমতটিরও দরকার। তাই শুধু তোমার মতামতের ওপর নির্ভর করছে আমার সব কিছু।

আমার এই ভালোবাসায় তোমার কণ্ঠে আজ বলতে চাই জয়তু বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, জয়তু ভালোবাসা।
সৌখিন
রাস-আল-খাইমা, ইউএই

খণ্ডিত

মানুষের জীবনে ভালোবাসা আসে, ভালোবাসা যায়। এ এক চিরন্তন খেলা। এ খেলায় কেউ জয়ী হয়, কেউবা হেরে বৈরাগী হয়। কিন্তু এই হারজিতের খেলায় কে দায়ী তা কোনোপক্ষই স্থির করতে পারে না। আমিও পারিনি।
যৌবনের ভরাঘাটে প্রেম এলো নিতান্ত আটপৌরে শাড়ির মতো অতি সাধারণভাবে। করাচির জেকব লাইন্সের একটা এফ টাইপ কোয়ার্টারের একটা রুম সাবলেট নিয়ে দুই বন্ধু থাকতাম। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের হলেও পোশাক-আশাকে কেতাদুরস্ত থেকে সেটা পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতাম। সকালে অফিসে বের হলে মাঝে-মধ্যে বাসার সামনের ঝুপড়ির পাশে এক সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাত্ হতো। করাচিতে এমন ঝুপড়ির সংখ্যা অসংখ্য। মালির নদীতে ঝুপড়ি, মুছা কলোনিতে ঝুপড়ি, জেকব লাইন্সে ঝুপড়ি। এসব ঝুপড়িতে ষাটের দশকেও বহু লাখোপতি বাস করতো। শিক্ষিত যুবক-যুবতীরাও বাস করতো।
মাঝে-মধ্যে দেখা হতে হতে লোহা-চুম্বকের আকর্ষণের মতো চোখাচোখি এবং এক পর্যায়ে আকর্ষণ অনুভব করলাম। অনেকদিন ভয়ে ভয়ে থাকলেও একদিন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আনমনে উচ্চারণ করলাম আসসালামু আলাইকুম এবং ভেতরে দেহমন হিম হয়ে গেল। পরক্ষণে কানে একটা কিনকিনে আওয়াজ অনুভব করলাম বেওকুব।
কয়েকদিন খুব ভয়ে ভয়ে কাটলো এবং এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বের হওয়ার সময় বদল করলাম। তবু একদিন দেখা হলো। পাশ কাটিয়ে যেতেই সে বলে উঠলো উস দিন কিসকো ছালাম দিয়া থা? -তোমকো বলেই দৌড়ে পালালাম এবং সেদিনও পেছনে আবার শুনলাম বেওকুব।
তারপর আমরা একে অপরের অনেক কাছে চলে এলাম। গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো আমাদের সম্পর্ক। ভালোবাসা থেকেই প্রেমের জন্ম। সেই অপ্রস্ফুটিত প্রেম অঙ্কুরিত হয়ে ডালপালা বিস্তার করে এক মহীরূহে পরিণত হলো। অভিসার শুরু হলো বিভিন্ন জায়গায়। আমরা চলে যেতাম কেয়ামারি, হকসবে, সেন্টসপিট সিবিচে। মনের আনন্দে পেখম মেলে হাওয়ায় ভর করে উড়ে বেড়াতাম দিক- িদগন্তে। হোটেল রেস্তোরার নির্জন কক্ষে, সিনেমা হলে, একে অপরের অনেক সান্নিধ্যে আসতাম। ফাক পেলে সে কখনো আমার রুমেও আসতো।
এভাবেই আমাদের কাটছিল। কিন্তু হঠাত্ একদিন বজ্রাঘাত হলো। জানতে পারলাম নাজমা বিবাহিতা দুসন্তানের জননী। স্বামী কোনো এক প্রাইভেট কম্পানিতে চাকরি করে। ব্যথাহত হয়ে সরে এলাম। এ কথাটা নাজমা জানতে পারলো না। আমি আর তার সামনে পড়তে চাইলাম না। নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম।
অফিসে এক মনে বসে কাজ করছি। হঠাত্ দরজার পর্দাটা একটু নড়ে উঠলো একটা মুখ। আমি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। মুখে কথা নেই। একটা আওয়াজ ভেসে এলো, আন্দার আ সাকতি হু? তখনও আমি বিমূঢ়। অনুমতির অপেক্ষা না করেই সোজা সামনের চেয়ারে বসলো নাজমা। অনেকক্ষণ দুজনের কথা নেই। নীরবতা ভাঙলো নাজমা-কান্নাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, কেয়া মায় তোমহারা ছাতি পর মুহ ছিপাকে রো রো কর চিল্লাউ-মায় তোমসে মহব্বত করতি হু-মায় তোমসে মহব্বত করতি হু? টেবিলে প্রসারিত হাতের ওপর চাপ দিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। দোপাট্টার আচলে চোখ মুছে বললো, চলো।
জানতে চাইলাম আমার অফিস চিনলে কি করে?
যার মনটা চিনতে পেরেছি তার অফিস চেনা কি দুরূহ ব্যাপার?
দুজনে অফিস থেকে বের হয়ে সোজা গান্ধী গার্ডেন (পরে এটার নাম নিশতার পার্ক রাখা হয়েছিল) এসে একটা নির্জন জায়গায় বসে বললাম, নাজমা বেগম, তুমি ছেলেমানুষী করছো। তোমার স্বামী সংসার, ছেলেমেয়ে আছে- আর আমি ভবঘুরে বাঙালি। সংসারের প্রতি মন দাও। নাজমা আমার বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে কাদতে কাদতে বললো, আমি ওসব কিছু বুঝি না। থাক আমার সংসার, থাক আমার ছেলেমেয়ে। তুমি আমার সব। তোমাকে ছাড়া আমি বাচবো না। তুমি আমার। তার পিঠের ওপর হাত রেখে অনেকক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ফল হলো না।
ধীরে ধীরে আমি দুর্বল হলাম। আবার এক অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করলাম নাজমার প্রতি। এ আকর্ষণের কূল-কিনারা নেই। নাজমা কেন্দ্রিক হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের প্রতি অপশন দেয়ায় আমাদের চাকরিচ্যুত করলো পাকিস্তান সরকার। জমানো টাকা ও রেডক্রসের একশ টাকার ওপর নির্ভরশীল হলাম। কাজ নেই সারাদিন বাসায় বসে থাকা। এতে যেন নাজমা খুশি হলো। অনেক সময় রান্না করা খাবার নিয়ে রুমে হাজির হতো। তাকে কাছে পেলে অপরূপ আনন্দ অনুভব করতাম।
সারাদিন বিছানায় শুয়ে আকাশকুসুম চিন্তা করছি। মনে হচ্ছে আমিও বোধহয় নাজমা ছাড়া বাচবো না। এ কেমন হলো? একদিন আমাকে চলে যেতে হবে তখন আমার কি হবে? নাজমাকে ছাড়া আমি কি আর কাউকে ভালোবাসতে পারবো? বিখ্যাত একখানা বইয়ের কয়েকটা লাইন আমাকে পীড়া দিতে লাগলো সারাক্ষণ। বিবাহিত নারীকে ভালোবেসে সর্ব দেশে সর্বকালে আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে একাধিক পুরুষ- পরের স্বামীর প্রেমে পড়ে কোনোদিন কোনো নারী রয়নি চিরকুমারী।
এভাবেই এক বছরের বেশি সময় কেটে গেল। তারপর জানলাম রেডক্রসের মাধ্যমে আমাদের রিপ্যাট্রিয়েট করা হবে। এ খবরে উভয় সঙ্কটে

পড়ে গেলাম। একদিকে মাতৃভূমি অন্যদিকে নাজমা। মন যার চলে যায় অন্যের হাতে তার চেয়ে অসহায় বুঝি আর কেউ হয় না। কথাটা একদিন নাজমাকে জানাতেই চমকে উঠলো। না তুমি যাবে না। তুমি কোথাও যেতে পারবে না। তুমি আমার। তুমি চলে গেলে আমি মরে যাবো। না তুমি আমাকে মেরে ফেলে চলে যাও।

রেডক্রসের কর্মীরা একখানা ফরম দিয়ে গেল পূরণ করে ফটো লাগিয়ে রেডক্রস অফিসে জমা দেয়ার জন্য। নাজমা রুমে এসে ফরম দেখে অগ্নিশর্মা। টান দিয়ে ফরমখানা টুকরা টুকরা করে পেপার বাস্কেটে ফেলে দিল। আমার বাধা দেয়ার আগেই সব শেষ। মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কিছুতেই তাকে বুঝাতে পারি না- আমাকে দেশে যেতেই হবে। আমার চাকরি নেই- এখানে থেকে কোনো লাভ নেই। না খেয়ে মরতে হবে। অনেক ঝগড়া-অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক কান্নাকাটির পর নাজমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলাম। ঘর থেকে বের হলাম না দুদিন। তৃতীয় দিনে ঝড়ের বেগে নাজমা এসে ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখেই ঘাবড়ে গেলাম নতুন ঝামেলার আশঙ্কায়। নাজমা ব্যাগ থেকে দুটি ফরম আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললো, সব সমস্যার সমাধান করে এলাম- এই নাও। দেখলাম একটা ফরমে তার ছবি লাগানো- পূরণ করা। আরো দুদিন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর ফরম দুটি সত্যিই হোটেল মেট্রোপোল রেডক্রস অফিসে জমা দিয়ে এলাম।

২৫ অক্টোবর '৭৩ আমাদের ভূগরোধ রিপ্যাট্রয়েশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। ২৯ তারিখে ফ্লাইট। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী খুব সকালে জেকব লাইন বন্দু খান কাবাব দোকানের কাছে থামতেই নাজমা ছুটে এসে ট্যাকসি ক্যাবে এসে ঢুকলো। বাংলাদেশে এসে হাফ ছেড়ে বাচলাম। লুকোচুরি প্রেমের সমাপ্তি হলো। বাধন ছাড়া নির্ভিক উন্মুক্ত জীবন শুরু হলো। প্রথম দুমাস নাটোরে গ্রামের বাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় পাগলের মতো হানিমুন চললো।

তৃতীয় মাসের দ্বিতীয়ার্ধে একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখলাম নাজমার চোখমুখ ফোলা। কান্না শেষে অশ্রুর পদচিহ্ন। ওদিকে না তাকিয়েই অন্য কাজে লেগে গেলাম। তারপর সব শান্ত। কিন্তু না। ওটা সাময়িক। রাতে বললাম, তোমার কি মন খারাপ করছে? তাহলে কাল চলো কোথাও ঘুরে আসি। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে কাদতে লাগলো। কাদতে কাদতে বললো, তাদের জন্য আমার মন খারাপ করছে। বাচ্চাদের জন্য, জানতে চাইলাম।

সবার জন্যই। উত্তর দিল।

অর্থাত্ স্বামী পুত্র কন্যা। আমি ফিরে যাবো। বুঝলাম মোহ কেটেছে। মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মোহের বশে মানুষ অন্যের জন্য জীবন দিতে পারে- মোহ কেটে গেলে সব অপরিচিত। মোহে আচ্ছন্ন হয়ে একদিন কিং অ্যাডওয়ার্ড রাজ্য ত্যাগ করে মিসেস সিমসনের সঙ্গে ঘর বেধেছিলেন সাধারণের মতো। আমরা সাধারণ মানুষ দেশ ত্যাগ করতে পারিনি। নাজমাও সাধারণ মানুষ ত্যাগের সীমা তার অপরিসীম। মন উঠে গেলে রক্তমাংসের শরীরটা বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়।

খবর পেয়ে বন্ধু-বান্ধব অনেকে এলো-বোঝাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুই আর হলো না। রিপ্যাট্রয়েশন তখনও চলছে। সব ফরমালিটি পুরা করে বন্ধুরাই নাজমাকে রেডক্রসের একটা ফিরতি ফ্লাইটে উঠিয়ে দিয়ে এলো। সঙ্গে নিয়ে গেল আমার হৃদয় ছেড়া আর এক বোঝা। ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ তখন প্রকাশ পায় ফল। বরীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার ভাবধারায় আমার ফল হলো বিপরীত।

ওয়ালিয়া, নাটোর থেকে

স্বপ্ন

মেঘবালিকা

২০০২-এ আমি তার সন্ধান পাই হসপিটালে। শুধুই দেখা আর তাতেই ভালোলাগা। যাকে আমি এতোটুকু জানতাম না, এমনকি চিনতাম না শুধু গল্প শুনতাম। ফোন নাম্বারটা পেয়ে তাতেই জানার সুযোগটা এলো।

সে থাকতো ইউনিভার্সিটির হলে। এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হলের লাইন পাওয়া যে কতো কষ্টকর ছিল তারপরও বারবার চেষ্টার পর যখন লাইন পেতাম হিমালয় পর্বত পাড়ি দেয়ার মতো জয়োল্লাস করতাম। এভাবে মাসে একবার তার সঙ্গে কথা হতো। কি যে ভালো লাগতো। পরের এক মাস সেই ভালোলাগাটা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। আর কিভাবে যে কেটে যেতো একমাস আমি টেরই পেতাম না।

হঠাত্ করে কোনো ফাকে তাকে আমি যেন কোথায় হারিয়ে ফেললাম। প্রায় এক বছর ফোনে, মোবাইলে হন্যে হয়ে খোজার পরও তাকে আমি কোথাও খুজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার এক বছরে একটি দিনও আমি তাকে ভুলে থাকতে পারিনি। বাইরে কোথাও গেলেই আমার চোখ দুটি শুধু একজনকেই খুজে বেড়াতো। সে হলো আমার স্বপ্ন, স্বপ্নপুরুষ। একদিন হঠাত্ করেই তাকে মোবাইলেই খুজে পেলাম। তার বন্ধ হয়ে যাওয়া মোবাইল নাম্বারটি আবার যখন অ্যাকটিভ হলো। প্রথম প্রথম অপরিচিত হয়েই এসএমএস করতাম

এই ভয়ে যে, সেই স্বপ্নপুরুষটি যদি আমাকে স্বাভাবিকভাবে না নেয়। আমার পরিচয় পাওয়ার পর যদি যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

খুব ভালোই চলছিল এসএমএস আদান-প্রদান। কিন্তু এভাবে আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। অবশেষে না পেরে পরিচয়টি জানিয়ে দিই তাকে। না সে আমাকে ফিরিয়ে দেয়নি বরং আমাকে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে গ্রহণ করেছিল। প্রতিদিন আমরা এসএমএস করতাম দুজন দুজনকে। স্বপ্নপুরুষটি কখনো আমাকে ফোন করতো না, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে, কি করছে প্রতিটি মুহূর্তে তা জানিয়ে এসএমএস করতো। এসএমএস পেতে পেতে মোবাইলের এসএমএস টোনটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় শব্দ হয়ে গিয়েছিল। আমি ফোন করতাম যখন-তখন, যখন আমার খুব বেশি ইচ্ছা করতো তখন। কখনো ব্যালান্স ফুরিয়ে যাওয়ার চিন্তা করতাম না। যদি কখনো কথা বলতে বলতে ব্যালান্স শেষ হয়ে যেতো, তখন আর কোনো উপায় না দেখে ভাইয়ার ঘর থেকে ভাইয়ার মোবাইল এনে বাকি রাতটুকু শেষ করতাম। এভাবে যে কতো রাত পার করেছি তা বলাই বাহুল্য। ভালোলাগাটা আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, কোনো অপরাধবোধ বা ভয় কোনো কিছুই আমার মধ্যে কাজ করতো না।

কোথাও ভালো, সুন্দর কোনো জিনিস দেখলেই শুধু তার কথাই মনে পড়তো। গল্প, উপন্যাস, যায়যায়দিন আমার অনেক পছন্দ, যখন যেটা পড়ে ভালো লাগতো তৎক্ষণাত্ তাকে ফোন করে ভালোলাগাটা শেয়ার করতাম। আর তা যদি সম্ভব না হতো তবে কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিতাম।

আমি কখনো রাত জাগতাম না। রাত জাগাটা বরাবরই খুব অপছন্দ ছিল। কিন্তু স্বপ্নপুরুষটি যদি কখনো রাতে জার্নি করে তার কর্মস্থলে যেতো আমি সারা রাত ঘুমাতে পারতাম না। একা জেগে থাকতাম নিজের ঘরে। একটু পরপর ফোন করতাম। কখনো যদি শুনতাম সে অসুস্থ আমার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো। নিজের ভেতর একটা অস্থিরতা কাজ করতো যতোক্ষণ না শুনতাম সে সুস্থ হয়েছে। যখন-তখন ফোন করতাম বলে সে প্রায়ই খুব বিরক্ত হতো। আর কি নিখুতভাবে আমাকে সে অবহেলা করতো। আর আমি এতোই নেশায় আচ্ছন্ন ছিলাম যে, আমি কিছুই টের পেতাম না। সবকিছু মিলিয়ে ২০০৫ আর ২০০৬-এর আগস্ট পর্যন্ত অনেক ভালো ছিলাম। নিজেকে সব মিলিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হতো। মনে হতো এভাবে অনন্তকাল কাটিয়ে দেয়া যাবে।

কিছুদিন আগে জানতে পারলাম সে বিয়ে করেছে। যে মোবাইলটা ছিল একসময় আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস, যেটাকে আমি এক মুহূর্তের জন্য দূরে রাখতাম না সেই প্রিয় জিনিসটিই আজ আমার সবচেয়ে অপ্রিয় জিনিস। এখন আমি তাকে খুব ভুলে যেতে চাচ্ছি, কিন্তু পারছি না। বিভিন্নভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখছি, যেন তাকে কখনো মনেই না পড়ে। সুখে থাকতে চাচ্ছি, কিন্তু সুখ আমাকে ছেড়ে দূর পাহাড়ের ওপারে চলে গেছে। আর কোনোদিনও হয়তো সুখ নামের বস্তুটি আমাকে ছোবে না। তারপরও আমি চাই আমার স্বপ্নপুরুষটি ভালো থাকুক, সুখে থাকুক, ভালোবাসা দিবসে এই কামনা শুধু তার জন্য।

স্বপ্ন, তোমার কি মনে পড়ে গত যায়যায়দিনের ভালোবাসার সংখ্যাটি চেয়েছিলাম। কেন জানো, ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে আমার সবচেয়ে প্রিয় উপহারটি পেতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু তুমি আমাকে তা দাওনি। বরং আমিই তোমাকে ভালোবাসার শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমাকে একটি যায়যায়দিন পাঠিয়েছিলাম।

আজ আবার যায়যায়দিনের মাধ্যমে তোমাকে ভালোবাসার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর সেই সঙ্গে তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

উত্তর বাড্ডা, ঢাকা থেকে

শুভাকাঙ্ক্ষীরা

আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি, এই দিনে সর্বপ্রথম হৃদয় নিংড়ানো পবিত্র ভালোবাসা ও পরম শ্রদ্ধা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতাকে। শুভেচ্ছা উজাড় করে দিলাম আমার বন্ধুবরেষু ভাইয়া গ কে এবং সব বন্ধুর সৌজন্যে যারা আমার কাছে আপন ভাইবোনের মতো পরম ভালোবাসার পাত্র - ভালো থেকো ভাইবোনেরা।

K

মুরাদপুর, চট্টগ্রাম

তোমারই মায়াবতী

তখন আমি ক্লাস টেন পড়—য়া এক স্বপ্নিল কিশোরী। প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াই, যা দেখি সব ভালো লাগে। বাসার মধ্যে অকারণ হইচই, উচ্ছলতা আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটি মন। ক্যাডেট কলেজের নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশেও সেই উচ্ছলতা একটুও কমে যায়নি। একবার ছুটিতে বাসায় এসেছি। কোনো এক শুক্রবার সকালে কলিংবেলের শব্দে দরজা খুলে একটি ছেলেকে দাড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আব্বু শিক্ষক হওয়ায় প্রায়ই সাবেক ছাত্ররা দেখা করতে আসতো। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো, স্যার আছেন?

আমার হঠাত্ কেন যেন মনে হলো, এ মুখ আমার খুব চেনা। মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল, আরে আপনি! আসুন আসুন।

ছেলেটি তো খুব অবাক। তুমি আমাকে চেন? মুখটা আবারো বিট্রে করলো, ঘাড় কাত করে বলে ফেললাম হ্যা।

ছেলেটি মনে হয় মজা পেয়ে গেল, বলো তো আমার নাম কি?

আমি তখন মনে মনে নিজেকে বকা দিচ্ছি। চিনি না জানি না অথচ...। হে ধরণী...! আমি তখন কোনো রকমে আব্বুকে ডেকে দিয়ে পালাতে পারলে বাচি।

পরে আব্বুর কাছেই শুনেছিলাম, তিনি দুবার বোর্ড স্ট্যান্ড করা আব্বুর প্রিয় ছাত্র। বুয়েটে ইলেকট্রকালে ভর্তি হয়েও পরিবারের ইচ্ছায় আর্মি অফিসার।

সেদিন সকালে সূর্যটা বেশি উজ্জ্বল ছিল কি না জানি না। জানি না পাখিরা বেশি মিষ্টি কণ্ঠে গান গেয়েছিল কি না। তবে বিধাতা বুঝি সেদিন মুচকি হেসেছিলেন।

এরপর চলে গেছে অনেক দিন। স্কুল-কলেজের পালা শেষে পা রাখলাম ইউনিভার্সিটির সবুজ চত্বরে। স্বপ্নিল কিশোরীটি ততোদিনে এক প্রাণবন্ত তরুণী।

ইউনিভার্সিটি জীবনের অবাধ স্বাধীনতা, নতুন লেখাপড়া, নতুন এক বিশাল বন্ধুবাহিনী, আড্ডা, হইচই। এর সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, বিতর্ক, দেয়াল পত্রিকা সবকিছু নিয়ে ভীষণ সুন্দর ব্যস্ততাময় দিন।

একদিন অনুভব করলাম, আমার এই অবিরাম ছুটে চলা জীবনটায় কোনো এক নিভৃত কোণে জ্বলে উঠেছে মায়াবী এক আলো। হৃদয়ের গহিনতম প্রদেশে এতোদিনে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল কল্পনার যে মানুষটির ছবি, সে যেন হঠাত্ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমি যেন শুনতে পাচ্ছি তার একান্ত আহ্বান, আমারই প্রতি। বিহ্বল আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মুখর। এই কি আমার গত্. জরময়ঃ? এই কি সেই স্বপ্নে দেখা চত্রহপব ঈযধৎসরহম? কে আমার একা স্বাধীন জীবনটাকে এলোমেলো করে দিচ্ছে এভাবে? এতোদিন তার কণ্ঠ শুনেছি ফোনে, পেয়েছি চিঠি। তীব্র ভালো লাগা কণ্ঠটি একদিন বলে বসলো, আমি আসবো তোমার সঙ্গে দেখা করতে। হলের বারান্দায় দাড়িয়ে আমি কেপে উঠলাম তীব্র ভালো লাগায়।

সারা রাত বাস জার্নি করে খুব ভোরে একদিন হলের সামনে উপস্থিত হলো সে। সেদিনটার প্রতিটি মুহূর্ত আমি আজো মনে করতে পারি। সময়টা ছিল শীতকাল। কুয়াশায় ভেসে ভেসে আমি দাড়ালাম তার সামনে। সূর্যের আলোর রশ্মি গায়ে মেখে যেমন ঝলমল করে ওঠে ভোরের শিশির, তেমনি করেই যেন আলোড়িত হলো আমার হৃদয়। এ যে আমার কিশোরীবেলায় দেখা সেই ছেলেটি! এতোদিন কোথায় ছিল সে? হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলেম। ভালোবাসার পূর্ণাঙ্গ প্রথম দেখা হওয়ার সেই দিনে আমার চিরচেনা ক্যাম্পাসটা হয়ে গেল যেন স্বর্গের উদ্যান। মনে হয়েছিল পৃথিবী আজ তার সব চোখ মেলে দেখে নিক আমার সুখ, আনন্দ। আমি জানলাম, আমার একা থাকার দিন শেষ হলো আজ। আমায় নিয়ে কেউ আজ থেকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবে।

ও যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল, তখন আমি পুরোপুরি এক ঘোর লাগা মানুষ। এরই নাম কি প্রেম? ভালোবাসার নীলপদ্মগুলো নিয়ে রাজপুত্র আজ এসেছে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে। ঘুম ভেঙে আজ আমি যেন চারপাশে দেখছি আশ্চর্য গোলাপ।

দিনগুলো এরপর কেটে যেতে লাগলো পাখির ডানায় ভর করে। বদলে গেল চেনা পৃথিবীটা। মুখরিত আড্ডার মধ্যে হঠাত্ আনমনা হয়ে যাই। ক্যাম্পাসের জুটিদের দেখে মনে হয় কি ভাগ্যবান এরা। আর আমার ভালোবাসার মানুষটি থাকে সেই কত্ত দূরে! তবু প্রতিটি মুহূর্তে আমি ওকে অনুভব করি, আমার আত্মার ভেতরে।

এরই মধ্যে একদিন ও বাবা-মাকে নিয়ে হাজির আমার বাসায়। হবু শ্বশুর যখন হাতে আংটি পরিয়ে দিলেন, মনে হলো জীবনের গতিপথ বদলে গেছে। একরাশ ভালো লাগা, সুখ আর স্বপ্নে মাখামাখি হয়ে এমন কোনো জগতে ভেসে চললাম, যার অবস্থান এ পৃথিবীর কোথাও নেই, অন্য কোনো জগতে। তারপর এক ভীষণ শুভক্ষণে বেজে উঠলো সানাইয়ের সুর। বিয়ের দিনের প্রতিটি ক্ষণ চিরস্মরণীয় হয়ে গেল মনের ভেতর। সব আত্মীয় আর বন্ধুর শুভ কামনায় সিক্ত হয়ে আমার হাত ধরলো সেই ছেলেটি। নববধূর লজ্জা, শেকড় ছেড়া কষ্ট সব ভুলে আমি অবাক হয়ে তাকালাম তার দিকে। কি অদ্ভুত! আজ থেকে ও আমার স্বামী!

বিয়ের পর লেখাপড়া শেষ করার জন্য সংসার করা হয়নি। আমি ইউনিভার্সিটির হলে আর ও প্রায় ২০০ মাইল দূরের কর্মস্থল ক্যান্টনমেন্টে। ছুটি পেলেই একে অন্যের কাছে ছুটে যাই। আগে আর্মি অফিসারদের সম্পর্কে অতি বিচিত্র সব ধারণা ছিল। ভাবতাম তারা খুব রাগি ও অহঙ্কারী। সরকারের বেশির ভাগ টাকাই তাদের বিলাসে ব্যয় হয় এবং তাদের স্ত্রীরা সেজেগুজে পার্টিতে যাওয়া ছাড়া কোনো কাজ করেন না। বন্ধু মহলে এ ধারণার কথা অবলীলায় প্রকাশও করতাম। ভাবতেই এখন হাসি পায়।

সব দর্প চূর্ণ করে আমি নিজেই এখন আর্মি অফিসারের বৌ! বন্ধুরা এ নিয়ে এখনো দুষ্টুমি করে। বিয়ের পর প্রতিটি দিন কাটছে শুধু অপেক্ষায়। প্রতিদিন অনেকবার ফোনে কথা হয়, তবু সপ্তাহে একটি সুন্দর চিঠির অপেক্ষা, দেখা হওয়ার অপেক্ষা। দুজন মিলে ছুটে গেছি

দেশের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে। কখনো সমুদ্রে, কখনো পাহাড়ে, প্রকৃতি আর মানুষের নিবিড় সাহচর্যে। একটু একটু করে আবিষ্কার করেছি ওর ভেতরের মানুষটাকে। দেখেছি পশুশিশু আর রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে ওর আন্তরিক নিরহঙ্কার কথা বলা। দেখেছি একই মানুষের ভিন্ন রূপ। যত্নশীল একজন প্রেমময় স্বামী, আদর্শ ছেলে, আন্তরিক বন্ধু। অবাক হয়েছি শিল্প সংস্কৃতি, বই, গান ইত্যাদি নিয়ে দুজনের পছন্দ-অপছন্দের মিল দেখে।

দুজনই বইয়ের পোকা। এমন কোনো বিষয় নেই যা আমি ওর সঙ্গে শেয়ার করি না। ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। প্রতিক্ষণ আমি অনুভব করি ভালোবাসার একটি উষ্ণ হাত আগলে রেখেছে আমাকে, পৃথিবীর কোনো কষ্ট যেন কাছে না আসতে পারে। আমার খাওয়া, লেখাপড়া, ঘুম এমনকি ছোটখাটো প্রতিটি ব্যাপারেই তার অসম্ভব খেয়াল। দূরে থেকেও একজন মানুষ কিভাবে সত্তার পুরোটা জুড়ে থাকে, আমি আজ তার উদাহরণ। আমার কল্পনার মানুষটিও এতোটা আপন ছিল না। আমার বাস্তব তাই স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর।

আর কিছুদিন পরই ও আফ্রিকা চলে যাবে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে শান্তির দূত হয়ে। কিন্তু আমি কি শান্তি পাবো? জানি না কিভাবে কাটবে একটা বছর। তবে জানি আমি নীল শাড়ি পরলে একজোড়া মুগ্ধ চোখ দেখতে পাবে না। কেউ জিজ্ঞাসা করবে না, কপালের টিপ কোথায়। খিচুড়ি আর বিফ খেতে বসলে জানি মনে পড়ে যাবে একটি প্রিয় মুখ। জানি কোনো বৃহস্পতিবারে আমাকে হঠাত্ ফুল হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়ে সারপ্রাইজ দেবে না কেউ। ক্লাস শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরবো অথবা দিন শেষে যখন ঘুমাতে যাবো, কোনো এক দূরদেশে থাকা মানুষটির কথা ভেবে হু হু করে উঠবে বুকের ভেতরটায়। দিন কাটবে হয়তো ভীষণ তীব্র অপেক্ষায়, টেনশনে, মঙ্গল কামনায়।

আমি বিশ্বাস করি, অপেক্ষার পালা শেষে আমার জীবনের শান্তির দূত হয়ে ও ঠিকই ফিরে আসবে আমার কাছে। তখন পূর্ণ হবে একসঙ্গে দেখা অধরা স্বপ্নটি। ছোট্ট একটা লাল-নীল সংসার, যেখানে অজস্র সুখ আর ভালোবাসার বসবাস। ফুটফুটে দুটি দেবশিশু যেখানে হাত ধরে খেলা করে। আকাশের চেয়েও বিস্তৃত স্বপ্নটির ছবি সামনে রেখে পার করবো বিরহের সমুদ্রটি।

পাঠকরা আমাদের অনাগত দিনগুলোর জন্য দোয়া করবেন। আর আমার বরটার জন্য রইলো আকাশজোড়া ভালোবাসা, যাকে পেয়ে আমি বিধাতার এ ধূলি ধূসরিত পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

সিলেট থেকে

এমনও বন্ধু হয়

কতো মানুষ তার বন্ধুর জন্য সর্বস্বান্ত হয়েছে। আবার কেউ তার বন্ধুর সহযোগিতায় সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্ত অতিক্রম করেছে। আমি আছি এই দুইয়ের মাঝামাঝি। যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তার প্রচলিত নাম ব্যবহার না করে আমি তাকে যে নামে ডাকতাম সে নামটিই ব্যবহার করা সঙ্গত বলে মনে করি। এতে তারও যেমন সম্মান রক্ষা হবে তেমনি আমার পরিচয়ও গোপন থাকবে। মেয়েটিকে আমি শিশির বলে ডাকতাম, তবে বলে রাখা ভালো আমি তাকে শিশির বলে ডাকলেও সে কখনো শিশির নামে ডাকাতে প্রবল আপত্তি করেনি। একবার নাকি তার বান্ধবীরা তাকে বলেছিল শিশির নামের মধ্যে একটি ছেলে ছেলে ভাব আছে - এই আর কি! শিশির যখন ক্লাস থ্রির ছাত্রী তখনই আমি তাকে প্রথম দেখি যদিও একই পাড়ায় দুজনের বাড়ি। পথ চলতে, শান বাধানো ঘাটে, হাটে, মাঠে কতো মানুষের সঙ্গেই তো পরিচয় হয় কিন্তু শিশিরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার এক মোহনীয় শক্তিতে আমাকে তার বন্ধু হতে বাধ্য করে। শিশিরের সঙ্গে কথা বলা, চলা থেকেই আমি ওর পরিবারের সঙ্গেও একেবারে ফ্রি হতে পারি। শিশিরকে না দেখলে আমি যেমন একদিনও থাকতে পারতাম না। ঠিক শিশিরও আমাকে না দেখে একদিনও থাকতে পারতো না। শিশির যখন ছোট ছিল তখন একদিন তাকে আমি ছবি ওঠানোর জন্য প্রস্তাব দিলাম কিন্তু সে ছবি উঠাতে রাজি না হওয়ায় আমি তাকে জোর করে ছবি উঠাই। শিশিরের সঙ্গে আমি এতো বেশি মিশতাম যে, তার সঙ্গে আমি নানারকম খেলাধুলা করতাম। সে সময়ে খেলাধুলার মধ্যে অন্যতম ছিল পাচগুটি, গোল্লাছুট ইত্যাদি।

আমরা দুজন একত্রে মাছ ধরতে যেতাম, বলা যায় মাছ ধরা ছিল আমাদের দেখাশোনারও একটি মাধ্যম। শিশির আমার কাছে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের, কেন আমি তার সঙ্গে এতো বেশি মিশি বা চলাফেরা করি।

জবাবে তাকে আমি বলেছিলাম আমি তার বন্ধু।

শিশির বলেছিল ছেলে এবং মেয়েতে কি বন্ধুত্ব হয়।

আমি বলেছিলাম আমরাই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। শিশিরের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া যেমন আমার রুটিন ছিল তেমনি ফিরে আসার সময় ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেকও ছিল আমার রুটিন।

কিন্তু আজ সবই স্মৃতি। আমি কখনো কারোর সঙ্গে প্রেম করিনি নিবিড়ভাবে। তবে বন্ধু বলতে শিশিরের চেয়ে ভালো বন্ধু আমার জীবনে আর কেউ ছিল না। হয়তোবা প্রেম, ভালোবাসা বা বন্ধুত্বের সংমিশ্রণে যা তৈরি হয় শিশির আমার জন্য একাই তা-ই ছিল। শিশিরের সঙ্গে আমার মজা করা, ওর নিকটআত্মীয়রা একেবারেই পছন্দ করতো না। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখ বিকালে আমি শিশিরের সঙ্গে দেখা করতে গেলে শিশির আমাকে বলেছিল আপনি আর কখনো আমাদের বাড়িতে আসবেন না, যদি কখনো আসেন তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

তখন ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তো। আমি তাকে বলেছিলাম আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলো। সে চোখে কান্না নিয়ে আমার দিকে তাকিয়েও ওই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে পেরেছিল। তবে আজো আমি জানতে পারিনি কেন সে সেদিন আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করেছিল। তবে আমি আর পরে কখনো শিশিরের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করিনি। শুনেছি স্বয়ং ঈশ্বরও নাকি মেয়েদের চিনতে পারেননি

আমি তো এক নরাধম মাত্র। তবে কেন জানি তার সঙ্গে খেলতে গিয়ে তার শরীরের পারফিউমের যে গন্ধ পেয়েছিলাম তা আজো আমি ভুলতে পারিনি। তবে আমি দেখেছি শিশির তার পরিচিত গণ্ডির মধ্যে নানান বন্ধুকে খুজে পেয়েছে। আমার অবিশ্বাসের দেয়াল এতো বেশি শক্ত যে, আমি আমার পাশে কোনো মেয়েকেই ভাবতে পারি না। আমি চাই না কারোর সঙ্গে সংসারী হতে কারণ মানুষকে বিয়ে করলে অন্তত তার সহধর্মিণীর ৭০ ভাগ ইচ্ছাকে মেনে নিতে হয়। বড় জোর ৩০ ভাগের মিল থাকতে পারে। যাকে আমি এতো দিনেও এতোটুকু চিনতে পারিনি একজন অপরিচিত মানুষের সঙ্গে সেখানে যুগ যুগ কিভাবে বসবাস করা সম্ভব।

এখনো আমি অনেক সময় লুকিয়ে লুকিয়ে শিশিরকে দেখি। দেখি সেই ছোট্ট শিশির আর আজকের এই শিশিরের মধ্যে কতো পার্থক্য। তার পৃথিবীতে কতো পরিবরতন ঘটেছে। আমার স্মৃতি তার কাছে কতো ধূসর, ভাবতেও অবাক লাগে। তবে আমি তাকে শত চেষ্টা করেও ভুলতে পারি না। আমার স্মৃতিতে তার স্মৃতি অম্লান, জাগ্রত। জীবন সায়াহ্নের যে প্রদীপ অস্তমিত হতে চায় তাকে জ্বালিয়ে রাখা যায় না, কারণ ওটি বিধাতার কাজ। এক্ষেত্রে কবিগুরুর কথাটি উল্লেখযোগ্য, একটি জড় পদার্থ ভেঙে গেলে ঠিক তাহার খাজে খাজে মিলিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মন জিনিসটির সজীব পদার্থ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তা আর রেখায় রেখায় মেলে না। আমি কি আর চেষ্টা করলেও তার সঙ্গে সহজ হতে পারবো!

এমনও হতে পারে আমি যোগ্যতার বিচারে পিছিয়ে বলে সে আমাকে অবহেলা করেছে। শুনেছি শিশির এখন তার ঘর গোছাতে ব্যস্ত। তবে আমি তার কল্যাণ কামনা করি। যেখানেই থাকি বিধাতার কাছে তার জন্য প্রার্থনা করবো। শিশির সুখে থাকলে জগতে আমার মতো সুখী আর কেউ হবে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

কুষ্টিয়া থেকে